সংগতিবিধানের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Adjustment)

1. যে সমস্ত ব্যক্তি সুষ্ঠু সংগতিবিধান করতে পারে তারা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারে।
2. সংগতিবিধানের মাধ্যমে ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সতেজ থাকে।
3. সংগতিবিধানের ফলে ব্যক্তির মানসিক তৃপ্তি ঘটে ফলে ব্যক্তিত্ব গঠন সুষ্ঠুভাবে হয়।
4. সংগতিবিধানের ফলে ব্যক্তির চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি হয় এবং সে নিজে ও তার চারপাশের পরিবেশকেও সুন্দর রাখতে পারে।
5. সংগতিবিধানে সার্থক ব্যক্তি অপরের রোল মডেল হিসেবে দৃষ্টান্তস্বরূপ হতে পারে।
6. সুষ্ঠু সংগতিবিধানের ফলে ব্যক্তি নিজের কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রতি যেমন শ্রদ্ধাশীল হয় তেমনি অপরের প্রতিও সমান উদার ও সহনশীল মনোভাবের পরিচয় বহন করে।
7. উগ্র জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলিতে সুষ্ঠু সংগতিবিধান যথেষ্ট সহায়তা করে।

সুষ্ঠু সংগতিবিধানসম্পন্ন ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of People with good Adjustment)

সুষ্ঠু সংগতিবিধানকারী ব্যক্তিদের আচরণের মাধ্যমেই চিহ্নিত করা যায়। মূলত যেসকল লক্ষণগুলি এদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলি হল—

1. ব্যক্তির নিজের সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা থাকে। তাদের নিজের দোষ, গুণ, ক্ষমতা, দুর্বলতা, ভালো-মন্দ ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান থাকে ফলে কোনো কাজে অসফল হলেও তারা নিজেদেরকে সামলে নিতে পারে।
2. ব্যক্তির মধ্যে তার চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে একটি সম্যক দৃষ্টিভঙ্গি, তার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির অবস্থান সম্বন্ধে ধারণা এবং পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া করে ভালো-মন্দ বিচারবোধ থাকে।
3. আন্তর্ব্যক্তি সম্পর্ক স্থাপন করে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করে চলে।
4. সুষ্ঠু সংগতিবিধানকারী ব্যক্তির মধ্যে প্রাক্ষোভিক ভারসাম্য থাকে অর্থাৎ প্রক্ষোভজনিত সমস্যাগুলি কম থাকে। সঠিকভাবে তারা প্রক্ষোভগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
5. উদ্‌বেগ, হতাশা, টেনশন ইত্যাদি মানসিক অবস্থাগুলি খুব সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারে। অকারণ ভয়-ভীতি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে পারে। সঠিক সিদ্ধান্ত দ্রুত নিতে সক্ষম হয়।
6. সুষ্ঠু সংগতিবিধানের অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে সামগ্রিক সক্রিয়তার মনোভাব লক্ষ করা যায়। তারা কোনো কাজেই পিছিয়ে আসে না। দৈনন্দিন জীবনধারণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সেইসব কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে।

Scanned with OKEN Scanner

দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সবকিছুকে বিচার করার চেষ্টা করে এবং তখনই তার সঙ্গে তার সমাজ পরিবেশের দ্বন্দ্ব বাধে যা তাকে হতাশার দিকে নিয়ে যায়। যেমন—চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণে খাবার খাওয়া নিষিদ্ধ এমন প্রাচীন ধারণাকে তারা মানতে পারে না। আবার আধুনিক বিজ্ঞানকে তারা অস্বীকার করতে পারে না। নিজেদের যুক্তিকে অপরের কাছে প্রতিস্থাপন করলে তাকে হেনস্থা হতে হয়, ফলে এসব কারণবশত অপসংগতি আসে।

12. **বাসস্থান পরিবর্তন:** পিতামাতার চাকরির কারণে অনেকসময় বাসস্থান পরিবর্তন করতে হয়। সেক্ষেত্রে শিশুর পুরোনো চেনা পরিবেশ থেকে হঠাৎ করে নতুন পরিবেশে এসে মানিয়ে নিতে খুব অসুবিধা হয়।
13. **অ-মনোবৈজ্ঞানিক পাঠক্রম:** বর্তমান সময় উপযোগী, শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ, অ-মনোবৈজ্ঞানিক পাঠক্রম শিশুদের আগ্রহান্বিত করে না। ফলে লেখাপড়া সর্বোপরি বিদ্যালয়ের প্রতি তাদের ভীতির মনোভাব গড়ে ওঠে এবং বিদ্যালয়ে যেতে চায় না। এতে শিশুরা বিদ্যালয়ের প্রতি অনীহার কারণে স্কুলছুট শিক্ষার্থী হিসেবে পরিগণিত হয়।
14. **বিদ্যালয়ের বাহ্যিক পরিবেশ:** অনেকক্ষেত্রে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে জায়গার অভাবে যত্রতত্র বিদ্যালয় গড়ে ওঠে ঠিকই কিন্তু সেই পরিবেশ একটি বিদ্যালয়ের পক্ষে অনুকূল নয়। যদি বিদ্যালয়টির অবস্থান এমন জায়গায় হয় যে জায়গাটি কোলাহলপূর্ণ তবে তা পড়াশোনার বিঘ্ন ঘটায়। এ ছাড়াও যদি পানীয় জলের ব্যবস্থা, শৌচালয়, খেলার মাঠ, অবসর যাপনের ব্যবস্থা, খোলামেলা পরিবেশ না হয় তবে তা শিক্ষার্থীর পক্ষে সেই বিদ্যালয়ের পরিবেশ কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে।
15. **বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ:** বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ যদি অস্বাস্থ্যকর হয়, সেখানে ঠিকমতো আলোবাতাস না পৌঁছোয়, ব্ল্যাকবোর্ডের অবস্থান যদি সঠিক স্থানে না হয়, বসার জায়গার অসুবিধা হয়, তবে শিক্ষার্থীরা ক্লাসে অমনোযোগী হয় এবং নানা দুষ্কর্ম করে। দুষ্কর্মের মাধ্যমে তারা বিরক্তিকর শ্রেণিকক্ষকে আনন্দময় করে তোলার চেষ্টা করে যা তাদের অপসংগতিমূলক আচরণকে মদত দেয়।
16. **স্বাধীনতার অভাব:** শিক্ষক-শিক্ষিকার অত্যধিক শাসনের দরুন শিক্ষার্থীরা ভয়ে থাকে ফলে তারা স্বাধীনভাবে কোনো কিছু করতে পারে না। তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধার সৃষ্টি হয়।
17. **গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতি:** প্রশিক্ষণের অভাবে অনেক সময় শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা একই পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের সামনে পাঠদান কার্যটিকে সম্পন্ন করেন। অপেক্ষাকৃত কঠিন পাঠটিকে তাঁরা শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে রসবোধ মিশ্রিত করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন না, ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণার সঞ্চার হয় না। শিক্ষার্থীরা অপেক্ষাকৃত কঠিন বিষয়টিকে পরিহার করে চলে এবং সেই বিষয়টিকে নিয়ে তাদের মধ্যে অহেতুক ভয়ের সৃষ্টি হয়।

Scanned with OKEN Scanner

18. **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার নীতি:** মনোবৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকার কারণে শিক্ষক-শিক্ষিকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার নীতির প্রতি কোনো ধারণা থাকে না, ফলে সব শিক্ষার্থীকেই একই কাজ প্রদান করেন এবং তাতে শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হলে তাকে তিরস্কার করেন যা তাকে হতাশার দিকে নিয়ে যায়।
19. **ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা ব্যবস্থা:** অনেকক্ষেত্রেই দেখা গেছে পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সবসময় চাপা টেনশন কাজ করে। অমূলক ভয়ের দরুন জানা জিনিসগুলিকেও পরীক্ষাক্ষেত্রে ভুল করে আসে। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একে অপরের প্রতি প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি করে এবং নানান অবাঞ্ছিত পথও তারা বেছে নেয় যা মোটেও মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়।
20. **সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির সুযোগ না থাকা:** বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের একঘেয়েমি দূর করার জন্য শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের অন্যতম আর-একটি বিষয় হল সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের অবসর বিনোদন সুষ্ঠুভাবে করতে পারে। বিদ্যালয়ে যদি এই সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির ব্যবস্থা না থাকে তবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরক্তি আসে, মানসিক ক্লান্তি দেখা দেয়। প্রাণচঞ্চল শিক্ষার্থীরা এমন সব আচরণ করে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে যাকে আমরা অপসংগতির লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করি।
21. **সহপাঠীদের ব্যঙ্গবিদ্রুপপূর্ণ আচরণ:** যদি কোনো শ্রেণিকক্ষে একটু অন্য ধরনের শিক্ষার্থী থাকে তবে সে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের ব্যঙ্গবিদ্রুপের শিকার হয়ে থাকে। অনেকসময় তাকে সহপাঠীদের অত্যাচারের শিকার পর্যন্ত হতে হয়। তাকে এতটাই উত্যক্ত করে তোলা হয় যে শেষপর্যন্ত আত্মহত্যার পথ পর্যন্ত বেছে নিতে হয়।
22. **আর্থিক অসংগতি:** শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন আর্থসামাজিক পরিবেশ থেকে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসে। অপেক্ষাকৃত আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা সবক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে না, যেমন—শিক্ষামূলক ভ্রমণ, বন্ধুদের সঙ্গে চড়ুইভাতি, শিক্ষামূলক সেমিনার, সিনেমা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করা। আর পাঁচজনের থেকে তিরস্কার লাভ করার ফলে তারা কোণঠাসা হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে নেতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি হয়।
23. **বন্ধুবিচ্ছেদ:** শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে দলগঠন করে থাকে। কোনো কারণে যদি কেউ দলছুট হয় তবে তার মধ্যে একাকিত্ব আসে।
24. **বিদ্যালয়ের প্রতি অভিভাবকের মনোভাব:** বিদ্যালয়ের নিয়মনীতি, আইনশৃঙ্খলা প্রভৃতির প্রতি যদি অভিভাবকের আস্থা না থাকে তবে শিক্ষার্থীদের মধ্যেও বিদ্যালয় সম্পর্কে খারাপ ধারণা গড়ে ওঠে। বিদ্যালয়ের প্রতি তারা আস্থাশীল থাকে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যথাযথ সম্মান করতে শেখে না।
25. **মূল্যায়ন ব্যবস্থা:** শুধুমাত্র নম্বরের ভিত্তিতে রিপোর্ট কার্ড তৈরি এবং তার ভিত্তিতে ভালো-খারাপ নির্ণয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঋণাত্মক মনোভাব গড়ে তোলে। নিজেদের অজান্তেই পরস্পরের বিরোধী হয়ে ওঠে ও এক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়।

26. **পরামর্শদানের অভাব:** ছোটো বয়সে শিক্ষার্থীরা অনেক ভুল কাজ করে থাকে বা তাদের মধ্যে কোনো জিনিসকে কেন্দ্র করে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। সঠিক পরামর্শ পেলে তারা সঠিকটি বেছে নিতে সক্ষম হয়।

উপরোক্ত কারণগুলিকে আমরা আপাতত প্রাথমিকভাবে অপসংগতিমূলক আচরণ করার জন্য চিহ্নিত করলেও কোনো কারণই এককভাবে শিক্ষার্থীর বিপথে গমনে সহায়ক নয়। মোটামুটিভাবে এই কারণগুলি যাতে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে অন্তরায় না হয়ে দাঁড়ায় তার জন্য শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, অভিভাবকদের এই সমস্ত কারণগুলি পরিহার করে চলা বাঞ্ছনীয়।

বিভিন্ন বয়সস্তরের শিক্ষার্থীদের অপসংগতিমূলক আচরণ (Causes of Maladjustment Behaviour of Students at Different Ages)

মনোবিজ্ঞানীরা প্রায়শই মানসিক রোগীদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। মানসিক রোগীরা অনেকক্ষেত্রেই দাবি করে যে, তাদের আচরণে কোনো অসুবিধা নেই। যারা তাকে ভরতি করেছে তাদের অসুবিধা।

স্বাভাবিকভাবেও আমরা অনেক সময় ভাবি আমার এই কাজটা করা কি অস্বাভাবিক হল? ব্যক্তির মধ্যে তৈরি মানসিক চাপ থেকেই তারা কিছু অবাঞ্ছিত আচরণ করে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যক্তির সেই সকল আচরণগুলি করার পিছনে কারণ নির্ণয় করতে পারলে অনেকক্ষেত্রেই অঘটন এড়ানো সম্ভব।

মনোবিজ্ঞানের ভাষায়—অস্বাভাবিক আচরণ কয়েকটা মাপকাঠি দিয়ে পরিমাপ করা হয়, যেমন—

- **Abnormality in frequency:** কোনো আচরণ প্রতিদিন গড়ে যতবার করা দরকার বা করা হয়, তার চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি বা কম সম্পাদিত হলে সেটা অস্বাভাবিক আচরণ বলে গণ্য করা যায়। অনেকটা পরিসংখ্যান দিয়ে আচরণকে মাপার চেষ্টা।
- **Abnormality as deviation from ideal:** কোনো আচরণ যেমন হওয়া উচিত বা কোনো কাজ যেমনভাবে করা উচিত তার থেকে উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতিকে অস্বাভাবিক হিসেবে গণ্য করা যায়।
- **Abnormality as a sense of personal discomfort:** অনেকে অস্বাভাবিকতাকে ব্যক্তিগত অস্বস্তি নির্দেশক হিসেবে গণ্য করেন। কোনো আচরণ বা কোনো কাজ কোনো ব্যক্তিকে যদি অস্বস্তিতে ফেলে তাহলে ওই আচরণ বা কাজটিকে অস্বাভাবিক হিসেবে গণ্য করা হয়।
- **Abnormality as inability to function effectively:** অনেকে অস্বাভাবিকতাকে দক্ষভাবে কাজ করার অক্ষমতার নির্দেশক হিসেবে গণ্য করেন। একজন যখন তার সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে অসুবিধায় পড়েন তখন সেটাকে অস্বাভাবিকতা হিসেবে দেখা যায়।

Scanned with OKEN Scanner

7. **যৌন অপরাধ (Sex-offences):** শিশুর অপরাধবোধটিই মূলত এর জন্য দায়ী, এ ছাড়াও থাকে অন্তর্দ্বন্দ্ব যার ফলে যৌন অপরাধের সৃষ্টি হয়।
8. **প্রতিবাদ-তর্ক (Challenging):** অনেকের মধ্যে নিজেদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা থাকে, তাদের মধ্যে থাকা আক্রমণধর্মিতার মনোভাবটির জন্য তারা সবসময় প্রতিবাদ ও বিতর্কের ঝড় তুলে ধরে।

অপসংগতি নিরাময় বা প্রতিকারসমূহ (Remedies of Maladjustment)

ব্যক্তি তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে কখনোই অস্বীকার করতে পারে না। ব্যক্তির সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব গঠনে সমাজের ভূমিকা অন্যতম। আবার সামাজিক পরিবেশ যদি ব্যক্তির অনুকূলে না থাকে সেক্ষেত্রে তারা অসহায় হয়ে পড়ে, অস্তিত্বের সংকটে ভোগে ফলে তাদের মধ্যে তৈরি হতে থাকে মানসিক চাপ যার বশবর্তী হয়ে ব্যক্তি অবাঞ্ছিত ও অমূলক ব্যবহার করে।

তাই ব্যক্তিকে সেক্ষেত্রে পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। অনেকক্ষেত্রেই ব্যক্তির কাঙ্ক্ষিত আচরণগুলিকেও সমাজের মানুষ অনুমোদন দেয় না। যেমন—কোনো কুসংস্কারের বিরোধিতা করা, কোনো নতুন নীতি প্রণয়ন, আইন, কৌশল, প্রযুক্তি অনেকাংশেই ভালো রীতিনীতিগুলির প্রতিষ্ঠা বা ভালো কিছুর প্রবর্তন বিরোধিতা ছাড়া হয় না সেক্ষেত্রে যে ব্যক্তি এই নিয়ম পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত থাকেন তাকে অনেক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। তাই পরিবেশ ব্যক্তির আচরণের রূপরেখা গড়ে না। ব্যক্তি কেমন আচরণ করবে তা যদি পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা, বিদ্যমান বাস্তবতা দ্বারাই নির্ণীত হয় তবে একই পরিবেশে মানুষ লালিতপালিত হয়েও ভিন্ন আচরণ করে কেন? পরিবেশ পরিবর্তনশীল আর এই পরিবর্তনশীলতার মূলেই রয়েছে ব্যক্তি। ব্যক্তির প্রতিটি আচরণের পিছনেই কোনো না কোনো কারণ থাকে। অনেকেই পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও কিছু মানুষ শত ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করেও স্বমহিমায় টিকে থাকে, পরিবেশকেই নিয়ন্ত্রণে আনে, প্রতিকূলতাকে অনুকূলে ফিরিয়ে আনে। সমাজ-সংস্কৃতির চর্চায়, সমাজের ব্যবধানে নানা বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। পরিবেশ ও বাস্তবতার মধ্যেও ভিন্ন চরিত্রের, ভিন্ন আচরণের মানুষ থাকে। একটি সমাজ-সংস্কৃতিতে সে আচরণ গ্রহণযোগ্য হতেই পারে। মানুষই সমাজ-সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে, আর পরবর্তীকালে তারাই অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

আবার একজন যেটাকে স্বাভাবিক আচরণ ভাবছে আরেকজন সেটাকে অস্বাভাবিক আচরণ বলে মনে করছে। এ ধরনের নানান দ্বিমুখী, পরস্পরবিরোধী, পথে-বিপথে কথাবার্তা, দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে এটাই বাস্তবতা, আর এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে দ্বন্দ্বমুখর মানবজীবন, সমাজজীবন, সাংস্কৃতিক জীবনের গতিধারা প্রবহমান থাকবে তবেই তো সুন্দর সমাজ গঠনে সুস্থ দেহ ও সুন্দর মনের মানুষ তৈরি হবে।

তা সত্ত্বেও ব্যক্তির সংগতিবিধানের ক্ষেত্রে তার সামাজিক পরিবেশ, বিদ্যালয় ও তার পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থেকেই যায়। কেননা শিক্ষাক্ষেত্রে অপসংহতি একটি

Scanned with OKEN Scanner

অপসংগতি রোধে বিদ্যালয়ের ভূমিকা (Role of School to Protect Maladjustment)

এ ব্যাপারে বিদ্যালয়গুলিরও কিছু করণীয় আছে। বিদ্যালয়ে শিশুকে সংগতিবিধান করে চলার শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষা ঠিকমতো দেওয়া হলে পরবর্তী জীবনে ও বৃহত্তর সমাজেও শিশু ঠিকভাবে সংগতিসাধন করে চলতে পারবে। বিদ্যালয়ের পরিবেশটিকে সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং আবহাওয়াটিও সুস্থ হওয়া দরকার। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ঝগড়া, মারামারি থেকে যাতে শিশুরা বিরত থাকে সেদিকে লক্ষ রাখা দরকার। শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক, শিক্ষক-শিক্ষক সম্পর্ক, ছাত্র-ছাত্র সম্পর্ক যাতে প্রীতি ও সম্মানের থাকে, তা ছাড়া এখানে যাতে শিশুরা সদ্‌গুণগুলি শেখে সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে। বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা, আচার-আচরণ, নিয়মানুবর্তিতা, সংঘবদ্ধতা ইত্যাদি সব কিছু যাতে স্বাভাবিক হয়, তাহলেই শিশুর ব্যক্তিত্বটি যথাযথভাবে বিকশিত হবে এবং সেও উপযুক্ত মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারবে।

1. বিষয় সর্বস্ব পাঠক্রম শিক্ষার্থীদের কাছে বোঝার মতো মনে হয় যেখানে তাত্ত্বিক আলোচনাই বেশি। পাঠক্রমে ব্যাবহারিক দিকটির প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করা দরকার। উপযুক্ত পাঠক্রম তৈরি করে শিক্ষার্থীদের স্মৃতির উপর চাপ এড়ানো সম্ভব হবে এবং তার ফলে স্কুলছুটের হার কমবে।
2. বিদ্যালয়ে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীলতা, শৃঙ্খলা, মতামত প্রকাশের ক্ষমতা, দল বেঁধে সকলের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করার ক্ষমতা, আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা ইত্যাদি দিকের বিকাশ হয়।
3. মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যদি শিক্ষণ প্রক্রিয়া চালানো যায় তাহলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অযথা ভয় তৈরি হবে না তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই পাঠগ্রহণ করবে। শিক্ষণ পদ্ধতি যতবেশি আকর্ষণীয় হবে ততই শিক্ষার্থীদের মধ্যে শেখার আগ্রহ আসবে ফলে ক্লাস পালানোর প্রবণতা কমবে।
4. শিক্ষকের আচরণ যেন শিক্ষার্থীদের প্রতি কঠোর না হয়, বন্ধুসুলভ ও পক্ষপাত মুক্ত মনোভাব থাকে।
5. যেহেতু দৈহিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সেহেতু দৈহিক সুস্থতা বজায় রাখার দিকটির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া দরকার।
6. বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিক্ষণের শিক্ষার্থীদের মধ্যে শারীরিক বিভিন্ন পরিবর্তন আসে, ফলে তাদের মধ্যে যৌন কৌতূহল তৈরি হয়। তাই বিদ্যালয়ে যৌনশিক্ষার প্রবর্তন একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বহন করবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।
7. মা-বাবার পরই শিক্ষকের স্থান, বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের আচার-আচরণ, ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি, স্নেহপ্রীতি, নিয়মানুবর্তিতা, পড়ানোর বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ, বিষয়-জ্ঞান, সবকিছুই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে শিশুর মনকে প্রভাবিত করে। তাই শিশু যদি শিক্ষকের কাছ থেকে সহানুভূতি, স্নেহ-প্রীতি না পায় তবে বিদ্যালয়

Scanned with OKEN Scanner

সম্পর্কে শিশুর মধ্যে বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়, যা তাদের মধ্যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে।

8. বিদ্যালয়ে পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতির মধ্যে শিক্ষার্থীর সার্থক অভিযোজন করার বিষয়টি লুক্কায়িত থাকে। অত্যধিক কঠিন পরীক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীদের বয়সস্তর ও মানসিক স্তর অনুযায়ী পরীক্ষাব্যবস্থাকে সংঘটিত না করা গেলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা অবাঞ্ছিত আচরণ যেমন—টুকলি করা, মিথ্যা কথা বলা, পরীক্ষা নিয়ে অহেতুক ভয় ইত্যাদির মতো বিষয়গুলির আধিক্য লক্ষ করা যায়। এ ছাড়াও প্রশ্নপত্রে যদি সঠিক কাঠিন্যমাত্রা বজায় না থাকে, শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্রের সঠিক মূল্যায়ন না করা হয় তাহলে, শিক্ষার্থীদের মেধার যথাযথ বিচার হয় না।
9. বিদ্যালয়ে যদি নির্দিষ্ট নিয়মশৃঙ্খলা না থাকে, বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজকর্ম যদি অবিন্যস্ত, অপরিকল্পিত হয়, বিদ্যালয়ে যদি শিক্ষার্থীদের উপর শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণ না থাকে, সবসময় যদি বিশৃঙ্খলা, চিৎকার হুল্লোড় বিরাজ করে তাহলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অশান্তি ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে, ফলে সামাজিকীকরণ সঠিকভাবে হবে না।
10. পড়াশোনা শেষ করার পর শিক্ষার্থীরা যেহেতু কর্মজীবনে প্রবেশ করে সেহেতু তাদের বিদ্যালয় থেকেই যদি সঠিক বৃত্তি নির্বাচনের নির্দেশনা দেওয়া যায় তাহলে কর্মক্ষেত্রের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে তাদের কোনো অসুবিধাই হবে না। প্রতিটি শিশু আলাদা আলাদা ক্ষমতা, আগ্রহ, দক্ষতা, রুচি, সামর্থ্য, বুদ্ধি, মেজাজ প্রভৃতি নিয়ে জন্মায়। সেই অনুযায়ী তাদের চাহিদাও ভিন্ন তাই তারা বিভিন্ন পেশার প্রতি আগ্রহ দেখায়। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ হবে সঠিক পরামর্শ ও গাইডলাইন প্রদান করা যাতে শিক্ষার্থীরা নিজের জন্য সঠিক পেশাটি নির্বাচন করতে পারে।

অপসংগতিমূলক আচরণের প্রকৃতি নির্ণয় (Detect the Nature of Maladjustmental Behaviour)

অপসংগতি দূর করতে হলে অপসংগতিমূলক আচরণগুলি করার পিছনে কারণগুলি জানা প্রয়োজন। যেমন—কোনো শিক্ষার্থী যদি মিথ্যা কথা বলে তবে তার পিছনের কারণটি কী সেটি নির্ণয় করে তাকে সঠিক পথে নিয়ে আসাই হল মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষ্য।

1. **তথ্যসংগ্রহ (Data collection):** অপসংগতির মূলে আছে কোনো না সমস্যা। তথ্যসংগ্রহ করার কারণ হল শিশুর ওই সমস্যাটির সম্বন্ধে একটা পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সংগ্রহ করা। আর এই তথ্য বিভিন্নভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছ থেকে যাদের সঙ্গে শিশুটি দিনের বেশির ভাগ সময়টিই অতিবাহিত করে, অ্যানাকডেটাল রেকর্ড কার্ড, বা শিশুর যদি কোনো ডায়ারি থাকে তবে তার থেকে শিক্ষার্থী সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব।
2. **পর্যবেক্ষণ (Observation):** শিশুর মধ্যে কোনো রূপ অস্বাভাবিক আচরণ পরিলক্ষিত হলে তাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তার সমস্যামূলক আচরণগুলি করার কারণ জানা সম্ভব। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের মধ্যে এবং বাইরে,

খেলার মাঠে, পাঠাগারে ইত্যাদি জায়গায় শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণ করে তার অপসংগতিমূলক আচরণ করার কারণ নির্ণয় করতে পারে।

3. **সাক্ষাৎকার (Interview):** অপর একটি ফলপ্রসূ পদ্ধতি হল সাক্ষাৎকার। তথ্যসংগ্রহ এবং পর্যবেক্ষণের পর যদি কোনো শিশু অপসংগতিমূলক আচরণযুক্ত শিক্ষার্থী হিসেবে চিহ্নিত হয় তবে তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে শিক্ষার্থীকে আরও গভীর অনুশীলন ও বিশেষ পর্যবেক্ষণ করে তাদের অপসংগতির স্বরূপ নির্ণয় করা যায়। এই সাক্ষাৎকারের জন্য প্রয়োজন অন্তরঙ্গতার, কেননা শিশুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে না মিশলে শিশু অনেক কিছুই লুকিয়ে যাবে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে না। এই ধরনের কৌশল বিশেষভাবে আয়ত্ত করতে হয়। মনোবিদ ক্লজমেয়ার-এর মতে মূলত যে সকল আচরণগুলি দেখলে শিক্ষার্থীর অপসংগতি রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে শিক্ষক ধারণা করতে পারেন সেগুলি হল— অস্থিরতা, হীনম্মন্যতা, বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া, অনমনীয়তা, অলীক কল্পনা করা, নেতিবাচক মনোভাব, অকারণ ভয়, সমালোচনার প্রতি স্পর্শকাতরতা, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতা, কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে করার অক্ষমতা, মিথ্যা কথা বলা, উত্তেজনা প্রবণতা, পলায়নী মনোভাব, আপন মনে কথা বলা, অত্যধিক লাজুক, পেটের গণ্ডগোল, কোষ্ঠকাঠিন্য, প্রক্ষোভমূলক অসাম্যতা, একা থাকা, শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা ইত্যাদি।
4. **অনুষঙ্গ পদ্ধতি (Association Process):** যারা মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বে বিশ্বাসী তাঁরা অচেতন মনের ক্ষমতার উপর বেশি আস্থাবান, তাঁরা চেতন মনে সংব্যাখ্যানের মাধ্যমে রোগের কারণ নির্ণয়ের পদ্ধতিতে বিশ্বাস করেন না। এই পদ্ধতিকে বলা হয় মুক্ত অনুষঙ্গের পদ্ধতি। যদিও এই পদ্ধতিটি মনোবিজ্ঞানী, চিকিৎসকরাই বেশি ব্যবহার করেন। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে শান্ত পরিবেশে বসানো হয় এখানে মূলত স্বপ্ন বিশ্লেষণের পদ্ধতির মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষা বা চাহিদাগুলির অপূর্ণতা সম্পর্কে জেনে রোগ নির্ণয় করা হয়।
5. **প্রশ্নগুচ্ছ (Questionnaire):** অপেক্ষাকৃত একটু বড়ো শিক্ষার্থী বা কৈশোরে প্রবেশাধীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা ধরনের অপসংগতিমূলক আচরণ নির্ণয় করার জন্য প্রশ্নগুচ্ছ ব্যবহার অত্যন্ত উপযোগী। এমন অনেক বিষয় আছে যা শিক্ষার্থীদের সরাসরি জিজ্ঞাসা করলে সঠিক উত্তর নাও পাওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে নাম গোপন করে উত্তরপত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বর্তমান মানসিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।
6. **সমাজমিতি (Sociology):** সামাজিক পছন্দ এবং অপছন্দ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে সমাজমিতি ব্যবহৃত হয়। সেক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীকে কেউ বা সবাই কেন পছন্দ বা অপছন্দ করে তার একটা আভাস পাওয়া যায়। ফলে ওই শিক্ষার্থীদের মধ্যে থাকা অপসংগতিমূলক আচরণকে সহজেই চিহ্নিত করা যায়।

Scanned with OKEN Scanner

মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব: অপসংগতি দূর করার ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বটি অত্যন্ত কার্যকরী। অপসংগতির মূল কারণ হল অবচেতন মনে কমপ্লেক্স গঠন। তাই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীর মনের অবস্থান লক্ষ করে সেই মতো নির্দেশনা দেওয়া যায়।

খেলাভিত্তিক চিকিৎসা: খেলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ করার সুযোগ পায়। শিশুরা খেলার মধ্যে দিয়েই নিজেকে প্রকাশ করে এবং আত্ম-তৃপ্তি লাভ করে। শিশুদের প্রবণতা, সামর্থ্য, প্রক্ষোভ, অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতি সকল কিছুই খেলার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। খেলার মাধ্যমে শিশু নিজেকে যত প্রকাশ করবে, যত বেশি ফুটিয়ে তুলবে ততই তার মানসিক স্বাস্থ্যটি সতেজ ও সুন্দর হবে। মানসিক সংগঠনটিও দৃঢ় হয়। খেলার মাধ্যমেই শিশুর আত্মপ্রকাশ ঘটে থাকে।

যদিও এই ধরনের পদ্ধতি ছোটো ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি কার্যকরী, এই পদ্ধতিতে চিকিৎসক অপসংগতিসম্পন্ন শিশুদের নানারকম খেলনা নিয়ে খেলার সুযোগ দেন। এর ফলে শিশুরা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নিজের মানসিকতা প্রকাশ করার সুযোগ পায়। খেলাভিত্তিক পদ্ধতি অপসংগতির প্রকৃতি নির্ণয়ে সহায়তা করে থাকে।

মেলানি ক্লেন্ ***(Melanie Klein)*** এবং আরও অনেক মনঃসমীক্ষকের পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গেছে, যে সমস্ত ছেলেমেয়ে মানসিক দিক থেকে অসুস্থ, তারা অন্যদের সঙ্গে খেলতে ভালোবাসে না। তারা একাএকাই থাকতে বেশি ভালোবাসে।

Aggerssiveness, Delinquency, Substance

A. আক্রমণাত্মক মনোভাব (Aggressiveness)

যে-কোনো শিশুর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু আচরণগত সমস্যা দেখা দিতে পারে। সাধারণত 2-4 বছর বয়স থেকেই শিশুর মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খিটখিটে ভাব, অসন্তুষ্টি, কাঙ্ক্ষিত জিনিসটি না পাওয়ার জন্য রাগ দেখানো প্রভৃতি নেতিবাচক আচরণগুলি পরিলক্ষিত হয়।

শিশুদের প্রতিনিয়ত রাগান্বিত বা আক্রমণাত্মক আচরণ সহ্য করা বাবা-মা অথবা শিক্ষক কারও জন্যই স্বাভাবিক বা সুখকর অভিজ্ঞতা নয়। তাদের এই আবেগের বহিঃপ্রকাশ যদি বাড়ির বাইরে হয় তাহলে এর পরিণতি ওই শিশুর জন্য আরও গুরুতর হতে পারে।

নিরাপত্তার অভাববোধ, আত্মপ্রতিষ্ঠা না পাওয়া, চাহিদার অভাববোধ, শিশুর জন্য প্রতিকূল এমন কোনো অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হওয়া এবং বড়োদেরকে অনুকরণ করার মাধ্যমেও শিশুর মধ্যে আক্রমণধর্মী আচরণ করার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। অনেকসময় দেখা গেছে শিশু সামান্য কারণেও ভীষণ চিৎকার চেঁচামেচি করে থাকে। এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিতে যুক্তরাজ্যের মেন্টাল হেলথ ফাউন্ডেশন সম্প্রতি 10 থেকে 15 বছর বয়সি 1323 জনের উপর গবেষণা করে। সেখান থেকে জানা যায় যে, শিশুদের আচরণ তখনই পরিবর্তন হয় যখন তারা দুশ্চিন্তা বা মন খারাপের মধ্যে থাকে। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী এক-চতুর্থাংশের দাবি যে তারা যখন উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়ে বা মন খারাপ থাকে তখন তারা মারামারি বা ঝগড়াঝাঁটিতে জড়িয়ে পড়ে।

Scanned with OKEN Scanner

প্রথমক্ষেত্রে; এটি একটি প্রতিক্রিয়া এবং দ্বিতীয়ত, একজন ব্যক্তির সম্মানকে জোরদার বা উন্নত করার জন্য তার ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করতে সাহায্য করা।

কারণ: কোন্ কারণে সাধারণত আগ্রাসন প্রকাশ করা হয় যার প্রতিক্রিয়ার উত্থান একটি ব্যক্তিকে উদ্দীপিত করে তোলে, তা বিবেচনা করা দরকার—

1. চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, মেজাজ।
2. আচরণগত, সামাজিক, মানসিক ধরন
3. ঘৃণা যা নৈতিক বিশ্বাসের সঙ্গে নিজেই প্রকাশ করে। সেই সঙ্গে সমাজে তাদের আদর্শগুলিকে আক্রমণাত্মকভাবে অনুমোদন করার চেষ্টা করে।

লক্ষণ: আক্রমণাত্মক মনোভাবসম্পন্ন শিশুদের মধ্যে বেশ কিছু আচরণ লক্ষ করা যায়, যার সাহায্যে শিশুকে আক্রমণাত্মক মনোভাব থেকে সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ-এর অপরাধপ্রবণতা থেকে দূর করে সঠিক জীবনযাপন করাতে সাহায্য করা যায়—

1. বেশির ভাগ সময় ঝগড়াটে, ক্রুদ্ধ, অসহযোগী এবং খিটখিটে মেজাজ থাকা।
2. ঘন ঘন রাগের তীব্র বহিঃপ্রকাশ বা চিৎকার চেঁচামেচি করা।
3. প্রতিনিয়ত ঝগড়া করার মেজাজে থাকা এবং যে-কোনো কিছু ঠিকঠাক না হলে অন্যকে দোষারোপ করা।
4. অতিরিক্ত রাগান্বিত শিশুরা সাধারণত একটা দ্বন্দ্বে ভোগে যে তারা কাকে বিশ্বাস করবে? আর কাকে করবে না।
5. এই ধরনের শিশুদের মেজাজ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তাদের বেশিরভাগের আবেগে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা খুবই কম।
6. এক পর্যায়ে গিয়ে তারা মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিক যোগাযোগের ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে।
7. দাঁতে দাঁত কষা, নখ কামড়ানো, নিজেকে দৈহিক আঘাত করা, আত্মহননের চেষ্টা প্রভৃতিও লক্ষ করা যায়।
8. স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা থাকা সত্ত্বেও পড়াশোনায় অমনোযোগী।
9. কোনো কাজ করার সময়ই ধৈর্য না থাকা।
10. প্রি-স্কুল বয়সে আগ্রাসনের প্রকাশ আরও বৈচিত্র্যময়। শিশু শুধুমাত্র কান্নাকাটি করে না, কামড়ানো, থুতু দেওয়া, আপত্তিকর শব্দের প্রয়োগও করে থাকে।

প্রতিকার: শিশুর অবাঞ্ছিত আচরণগুলি প্রাথমিক অবস্থায় যদি মোকাবিলা না করা হয়, তাহলে পরবর্তী প্রজন্ম তাদের জীবনের শুরু থেকে ব্যর্থ হতে থাকবে এবং সমস্যাগুলি সময়ের সঙ্গে চলতেই থাকবে। মেজাজ প্রকাশের স্বাভাবিক সীমা অতিক্রমকে তারা আর পরোয়া করে না। সেই সঙ্গে এই আচরণ তাদের বিকাশ এবং জীবনের সম্ভাবনার পথে বিপদ ডেকে আনে। তখন এই বিষয়টিকে খতিয়ে দেখা জরুরি বলে মনে করেন গবেষকরা।

Scanned with OKEN Scanner

1. শিশুদের এই জাতীয় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের বিপুল ধৈর্য প্রদর্শন ও ভালো আচরণ করতে হবে এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হবে। শিশুকে এ সময় কোনোভাবেই বকাবকি বা মারধর করা যাবে না। খেয়াল রাখতে হবে, এ সময় অভিভাবকদের ব্যবহার যেন শিশুর কাছে সবসময় ইতিবাচক বা পজিটিভ থাকে।
2. শিশু যদি মারাত্মক ধরনের কোনো ভুল বা অপরাধ করে থাকে (যেমন—কারও সঙ্গে দুর্ব্যবহার, কাউকে মারা, চুরি, গালাগালা, ভাঙাচুর ইত্যাদি) তাহলে পরবর্তী সময়ে এর জন্য ক্ষমা চাওয়া, জিনিস ফেরত দেওয়া ইত্যাদি করা শিশুকে সুকৌশলে শেখাতে হবে।
3. শিশুর আক্রমণাত্মক মনোভাবের ব্যাপারে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। শিশুর যে-কোনো রকম অবাঞ্ছিত আচরণকে ভালোবাসা, স্নেহ, সহমর্মিতা দ্বারা বোঝানোর মাধ্যমে দূর করার প্রয়াস করতে হবে। প্রয়োজনে বিদ্যালয়গুলিতে একজন করে মনশ্চিকিৎসক নিয়োগ করতে হবে, যাতে তারা শিশুর যে-কোনো রকম মানসিক সমস্যা এবং তার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে চিহ্নিত সমস্যামূলক আচরণগুলির সঠিক নিরাময় করতে পারেন।
4. অভিভাবকরা সচরাচর যেসব শিশুর প্রতি অবহেলা করে থাকেন, সে ধরনের শিশুদেরই এসব সমস্যা বেশি দেখা যায়। এরকম কোনো আচরণ করে থাকলে এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।
5. বর্তমানে পিতামাতা উভয়েই কর্মব্যস্ত থাকেন। সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে পরিচারিকার সাহায্য নিতে হয়। অনেকক্ষেত্রে পরিচারিকারা শিশুর যত্নের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখেন না। শিশুর বিভিন্ন চাহিদাগুলিও পূরণ হয় না। ফলে শিশু নিরপত্তাহীনতায় ভোগে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে আক্রমণের মাধ্যমে।
6. শিশু তার বদ অভ্যাস যদি অল্প সময়ের জন্যও (বা সাময়িকভাবে) ত্যাগ করে, তার জন্যও শিশুকে খুবই প্রশংসা করতে হবে। সম্ভব হলে এর জন্য তাকে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা খুবই ভালো পদক্ষেপ।
7. শিশুদের যথাসম্ভব উৎফুল্ল পরিবেশে রাখতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে যে, এই সব অভ্যাস ঠিক নয় এবং এগুলি তাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর।
8. শারীরিকভাবে পিছিয়ে থাকা শিশুদের মধ্যেও হীনম্মন্যতাজনিত প্রক্ষোভের কারণে আক্রমণাত্মক আচরণ পরিলক্ষিত হয়। শিশুর কোথায় সমস্যা হচ্ছে সেটি চিহ্নিত করা, বিশেষত চোখের বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোনো সমস্যা আছে কিনা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তা পরীক্ষা করে দেখা। বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে স্নায়ুতন্ত্রের কোনো সমস্যা আছে কিনা তাও দেখা জরুরি।
9. স্বাভাবিক ক্ষমতা অনুযায়ী তারা যে সমস্ত কাজ করতে পারে, সেগুলিকে উৎসাহিত করে, তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করতে হবে।

B. অপরাধ (Delinquency)

অপরাধ প্রতিটি সমাজেই প্রায় সাধারণ ঘটনা সমাজের পরিবর্তনশীল অবস্থা অনুযায়ী অপরাধের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে। অপরাধের আইনি সংজ্ঞাই হল নিরপরাধীকে সুরক্ষা দেওয়া এবং দোষীকে শাস্তি দেওয়া। **পল টাপ্পান** (***Paull Tappan***, 1960) অপরাধের সংজ্ঞা হিসেবে বলেছেন এটি একটি ইচ্ছাকৃত কাজ যা কোনো অবাধ্যতা বা সংগত কারণ ছাড়াই ঘটে। ফৌজদারি আইনের লঙ্ঘনের জন্য একে গুরুতর অপরাধ বা একটি অসদাচরণ হিসেবে দেখা হয়, যার জন্য রাষ্ট্র শাস্তির সুপারিশ করে।

তবে একটি মানব শিশু জন্মানোর পর তাকে মানসিক, শারীরিক, সামাজিক সুরক্ষা দেওয়াই যে পিতামাতা, শিক্ষক বা রাষ্ট্রের একমাত্র ও অন্যতম কর্তব্য তাই নয়। শিশুটির মধ্যে যাতে মানবিক গুণগুলির বিকাশ ঘটে, তার অন্তর্নিহিত গুণাবলির বিকাশসাধন হয়, নৈতিক বিকাশের দিকটি উন্নত হয় এবং সে যেন রাষ্ট্রের জন্য মানবীয় সম্পদে পরিণত হতে পারে সেদিকে তাকে পরিচালনা করা।

বর্তমানে আধুনিক বিশ্বের অসংগঠিত সমাজব্যবস্থায় দ্রুত শিল্পায়ন ও নগরায়নের নেতিবাচক ফল হল কিশোর অপরাধ। পরিবার কাঠামো দ্রুত পরিবর্তন, শহর ও বস্তির ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ এবং সমাজজীবনে বিরাজমান নৈরাজ্য ও হতাশা কিশোর অপরাধ বৃদ্ধির প্রধান কারণ। অপসংস্কৃতির বাঁধ ভাঙা জোয়ারও এজন্য অনেকাংশে দায়ী।

এই বয়সের ছেলেমেয়েদের সামনে থাকে অদম্য আশা আর জীবন জগৎ সম্পর্কে থাকে অতিকৌতূহল। অনেক সময় প্রতিকূল পরিবেশের কারণে আশাভঙ্গের বেদনায় হতাশার হাত ধরে নৈরাশ্যের অন্ধকারে পতিত হয় তাদের জীবন। এতে কিশোর বয়সিরা ধীরে ধীরে অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ে। কিশোর অপরাধ দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অপরাধ বিজ্ঞানী **বিসলার** বলেছেন, "কিশোর অপরাধ হল প্রচলিত সামাজিক নিয়মকানুনের উপর অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিশোরদের অবৈধ হস্তক্ষেপ।"

আবার অপরাধ বিজ্ঞানী **বার্ট** বলেছেন, "কোনো শিশুকে তখনই অপরাধী মনে করতে হবে যখন তার অসামাজিক কাজ বা অপরাধ প্রবণতার জন্য আইনগত ব্যবস্থার প্রয়োজন পড়ে।"

অপরাধের লক্ষণ: বিদ্যালয়ে এবং সমাজে মানব শিশুর মধ্যে মূলত যে সকল অপরাধের লক্ষণ বা আচরণগুলি দেখা যায় সেগুলি হল—

1. কারোর কোনো কথা না শোনা। অবাধ্যতা তাদের মধ্যে এক চরম সুখ এনে দেয়। সব সময় তাদের মধ্যে একটা don't care ভাব লক্ষ করা যায়।
2. সময় মতো ক্লাসে না আসা, ক্লাসে অমনোযোগী ক্লাসে ডিসটার্ব করা, শিক্ষক শিক্ষিকা বা অভিভাবক-অভিভাবিকার মুখে মুখে কথা বলা।
3. সহপাঠীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়ানো, মারামারি করা, বই ছিঁড়ে দেওয়া, থুতু ছেটানো, যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করা, মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি করে নেওয়া।
4. স্কুল পালিয়ে নিজের কাঙ্ক্ষিত কাজগুলি করা।
5. পরীক্ষার সময় অসদুপায় অবলম্বন করা।

Scanned with OKEN Scanner

6. নেশাজাত বস্তু সেবন।
7. ক্রমশ পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়া ইত্যাদি।

অপরাধের কারণ

1. সমাজে বিদ্যমান হতাশা, নৈরাজ্য আর দারিদ্র্যতা কিশোর অপরাধ সৃষ্টির প্রধান কারণ।
2. শহরের দূষিত পরিবেশে মানবেতর জীবনযাপন ও অশিক্ষা, ক্ষুধা, দারিদ্র্য কিশোরদের চুরি, ছিনতাই, পকেটমারের মতো অপরাধমূলক কাজ করতে বাধ্য করে।
3. সঠিক পরিবেশের অভাব, সামাজিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণের অভাব।
4. ভগ্ন পরিবার ও পিতামাতার দাম্পত্য কলহ যেখানে আবেগ, ভালোবাসা ও নিরাপত্তার অভাব রয়েছে।
5. চরম দারিদ্র্য ও পিতামাতার অবহেলা শিশু শ্রম ও জোরপূর্বক শিশুকে কাজে বাধ্য করা।
6. খারাপ সঙ্গীর সঙ্গে চলাফেরা করা, পারিবারিক অস্থিতিশীলতা ও অসম্প্রীতি, মাদক দ্রব্যের সহজলভ্য ও সেবন।
7. পিতা বা মাতার পুনর্বিবাহ কিংবা পিতামাতার অকাল প্রয়াণ।
8. মা কর্মজীবী হওয়ায় শিশুর পর্যাপ্ত যত্নের অভাব।
9. অতিরিক্ত শাসন, রক্ষণশীলতা ও বাবা-মার পরস্পর বিরোধী মানসিকতা, স্বার্থপর ও ফন্দিবাজ রাজনীতিবিদ কর্তৃক কিশোরদের পিকেটিং-এ ব্যবহার, সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অভাব এবং অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ইত্যাদি।

অপরাধ মোকাবিলার উপায়

কিশোর অপরাধের ভয়াবহ পরিণতি উপলব্ধি করে আমাদের উচিত কিশোরদের অন্ধকার থেকে আলোর জগতে ফিরিয়ে আনা। কিশোর অপরাধ সৃষ্টিতে শুধু কিশোররাই দায়ী নয়।

এজন্য দায়ী আমাদের পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থা, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা। তাই সরকারি প্রচেষ্টা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। কিশোর অপরাধ মোকাবিলায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে—

1. কিশোর অপরাধ মোকাবিলায় সর্বপ্রথম এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জেনে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
2. কিশোরদের সুষ্ঠু আবেগীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে যত্নবান হতে হবে।
3. সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র শিশু-কিশোরদের জন্য সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
4. শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশে পিতামাতাকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সন্তানের ভালোলাগা ও মন্দলাগাকে বিচার করতে হবে।
5. কিশোরের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের জন্য গঠনমূলক পারিবারিক, সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।
6. দেশে পর্যাপ্ত কিশোর অপরাধ সংশোধন কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।

7. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমগুলি শিশুর মানসিক বিকাশের উপযোগী কার্যক্রম ও অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে পারে।

কৈশোরকাল থেকেই ব্যক্তি শিশু ভবিষ্যতের জন্য তৈরি হয় আর এই সময়টাই যেহেতু ঝড়ঝঞ্ঝারকাল, তাই মূলত এই বয়সটা নিয়েই এখানে আলোচনা করা হল। কৈশোরকাল মানুষের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের সময়। এই সময় থেকেই মানুষ অনেক আশা ও স্বপ্ন নিয়ে পরিপূর্ণ জীবন গড়ে তুলতে শুরু করে। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশের কারণে অকালেই সে আশাহত হয়। হতাশা আর নৈরাজ্য জীবনকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়। কিশোরের সুপ্ত প্রতিভা অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায় তারা অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। তাই যে সকল বহুমুখী কারণে কিশোর অপরাধের সৃষ্টি তা রোধ করতে হবে। আমাদের বর্তমান কিশোরদের প্রকৃত মানুষ ও নিরপরাধী হিসেবে গড়ে তুলতে পারলেই জাতির উন্নতি সম্ভব।

C. বস্তুগত অপব্যবহার (Substance Abuse)

মাদকাসক্তি বলতে মাদকদ্রব্যের নেশাকে বোঝায়। যেসব দ্রব্য সেবন করলে আসক্তির সৃষ্টি হয়, জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা ও স্মৃতিশক্তি কমে যায় সেগুলি মাদকদ্রব্য। ব্যাপক অর্থে যে দ্রব্য গ্রহণের ফলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটে এবং ওই দ্রব্যের প্রতি নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয় পাশাপাশি দ্রব্যটি গ্রহণের পরিমাণ ক্রমশই বাড়তে থাকে এমন দ্রব্যকে মাদক দ্রব্য বলে। ব্যক্তির এই অবস্থাকে বলে মাদকাসক্তি। সিগারেট, বিড়ি, তামাক, চুরুট, মদ, তাড়ি, গাঁজা, চরস, ভাং, মারিজুয়ানা, হেরোইন, ফেনসিডিল, মরফিন, ইয়াবা ইত্যাদি মাদকদ্রব্য। এ এক ভয়ংকর নেশা। এই নেশা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন।

মাদকাসক্তির কারণ

মাদকাসক্তির কারণগুলি হল—

1. মাদকের সহজলভ্যতা
2. বন্ধুদের চাপে পড়ে অনেকে মাদক নিয়ে থাকে।
3. বাবামায়ের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অনেকে মাদক গ্রহণ করে থাকে।
4. অনেকের মাঝে মাদক নিয়ে স্মার্ট হওয়ার প্রবণতা থাকে, যা তাকে ঠেলে দেয় মাদকের জগতে।
5. মানসিক সমস্যা, যেমন—হতাশা, একাকীত্ববোধ, বিষণ্ণতার কারণে এসব থেকে রেহাই পেতে মাদককে বেছে নেয়।
6. অ্যান্টি সোশ্যাল পারসোনালিটি, শৈশবে বিকাশে সমস্যা থাকলেও অনেকে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।
7. ভালোবাসার সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার মানসিক কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে মাদকগ্রহণ করে।
8. পারিবারিক কারণেও অনেকে মাদকে জড়িয়ে পড়ে।
9. পারিবারিক কোলাহলের কারণে অনেক সময় মাদকে আসক্ত হয়ে থাকে।
10. সহপাঠীদের চাপে পড়ে অনেকে মাদক নিয়ে থাকে।

Scanned with OKEN Scanner

মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল

1. আফিম জাতীয় মাদকদ্রব্য সেবনে বিভিন্ন শারীরিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যেমন—বমি বমি ভাব, ঘাম হওয়া, চুলকানি ও মাথাঘোরা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্বাস প্রশ্বাসের অসুবিধা দেখা দেয় এবং মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতাও হ্রাস পায়।
2. গাঁজা জাতীয় মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারীকে নিস্তেজ করে ফেলে। গাঁজাজাতীয় মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে শ্বাসপ্রশ্বাস সংক্রান্ত সমস্যা, ফুসফুস এবং গলার ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে।
3. মাত্রাতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খেলে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়, জ্ঞান হারিয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুও হতে পারে।
4. মদ বা অ্যালকোহলে আসক্ত হয়ে পড়লে ব্যক্তির ভালোমন্দ বিচারের ক্ষমতা কমে যায়। বেশি পরিমাণ মদ পান করলে অচেতন হয়ে পড়তে পারে। দীর্ঘদিন মদ পান করলে পানকারী বিভিন্ন প্রকার অপুষ্টিতে ভোগে এবং লিভার সিরোসিসের মতো মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হতে পারে।
5. তামাকের মধ্যে নিকোটিন আছে। এটি শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এটি রক্তের চাপ বৃদ্ধি করে এবং স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতিসাধন করে। যারা বহুদিন ধরে সিগারেট বা তামাক সেবন করে তাদের ফুসফুস এবং শ্বাসতন্ত্রের ক্ষতি হয়।

ধূমপান ও মাদকাসক্তি থেকে বিরত থাকার উপায়

কিশোর কিশোরীরা কৌতূহল বা উত্তেজনার বশে কিংবা কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এমন কিছু করতে পারে, যা পরবর্তী জীবনের জন্য অনুশোচনা কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য কৌতূহলবশত, বা উত্তেজনা বা হতাশা দেখা দিলেও প্রথমেই ভাবতে হবে কোন্ কাজ করলে তার ফলাফল কী হতে পারে। এ জন্য দরকার কখনো কোনো অবস্থাতেই ধূমপানসহ অন্য কোনোভাবে মাদক সেবন না করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া। ধূমপান ও মাদক দ্রব্য সেবনের কুফলগুলির প্রত্যেকটি বিবেচনা করলে মাদক সেবন থেকে দূরে থাকা সহজ হবে। এজন্য নীচের ধাপগুলি অনুসরণ করতে হবে—

1. ধূমপান বা মাদক সেবন না করার বিষয়ে প্রথমেই দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে পারলে এই সর্বনাশা কাজ থেকে বিরত থাকা যায়।
2. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথমে পরিস্থিতি, সমস্যা, বিপদ চিহ্নিত করে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক কিংবা অন্য কোনো সূত্র থেকে তথ্যসংগ্রহ করতে হবে। তথ্যের প্রেক্ষিতে করণীয় সমাধান চিহ্নিত করে তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে।
3. মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর দিক জেনে সবার উচিত এর থেকে নিজে মুক্ত থাকা, বন্ধুবান্ধব ও অন্যদেরকে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে উদ্‌বুদ্ধ করা।

মাদকমুক্ত থাকার ক্ষেত্রে অন্যদের ভূমিকা

মাদকাসক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বন্ধুবান্ধবদের ক্ষতিকর প্রভাব বেশ বড়ো ভূমিকা পালন করে, তবে সব বন্ধুই কি মাদকাসক্ত, নিশ্চয়ই না। দু-একজন হয়তো দুর্ভাগ্যক্রমে মাদকাসক্ত হয়, তবে বেশিরভাগ বন্ধুই ভালো হয়। আর এই ভালো বন্ধুরাই অন্য বন্ধুদেরকে মাদক গ্রহণে বাধা দিতে পারে। পিতামাতারও এ ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন, সহানুভূতির সঙ্গে সব কিছু সামলানো প্রয়োজন। এ ছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ, ছাত্রদের কাছে শিক্ষক আদর্শস্বরূপ। শিক্ষকের আদেশ-উপদেশ ছাত্ররা আন্তরিকভাবে পালন করে। আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীরাও স্নেহ, ভালোবাসা ও আন্তরিকতা দিয়ে ছেলেমেয়েদের মাদকমুক্ত থাকতে সাহায্য করতে পারে। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম, যেমন—পত্রপত্রিকা, রেডিয়ো, টেলিভিশনে মাদকবিরোধী প্রচার চালিয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে। এর বাইরে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেও মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা যায়।

প্রশ্নাবলি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. মানসিক স্বাস্থ্যের আধুনিক ধারণার ব্যাখ্যা দাও।
2. মানসিক স্বাস্থ্যের বৈশিষ্ট্যাবলি আলোচনা করো।
3. মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পরিধি আলোচনা করো।
4. মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করো।
5. মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা কী?
6. মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে শিক্ষার কী সম্পর্ক?
7. মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হওয়ার কারণগুলি আলোচনা করো।
8. মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষায় গৃহের ভূমিকা কী?
9. মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষায় বিদ্যালয়ের ভূমিকা কী?
10. দুর্বল মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণগুলি কী?
11. সংগতিবিধান কাকে বলে?
12. সংগতিবিধানের জন্য যে-কোনো দুটি শর্তাবলির উল্লেখ করো।
13. অপসংগতি কাকে বলে?
14. অপসংগতির যে-কোনো দুটি কারণ উল্লেখ করো।
15. অপসংগতিমূলক আচরণগুলি কী?

Scanned with OKEN Scanner